ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
Lok Proshason Samoeeky
সংখ্যা: ৪৩/No. 43
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪/June 2007

পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা (১৯৪৭-১৯৫৮)
একটি সমীক্ষা

ড. মো. রুহুল আমিন*

Abstract: *To form and direct the government both the Parliamentary and the Presidential form of government Prevail in the democratic system. Only the Parliamentary system of government plays significant role in the sphere of making a good relationship between the executive and the legislature as well as making the executive responsible to the legislature directly and collectively. The main objective of this study is to make a modest evaluation of the role of the Parliamentary system of government from 1947-1958 in Pakistan.*

ভূমিকা

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যুগপৎ নন্দিত ও নিন্দিত। তবে নিন্দার তুলনায় এ শাসন ব্যবস্থার প্রশংসার দিকটিই বেশি পরিদৃষ্ট হয়। গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের দুর্বলতার কারণ অনেক হলেও তিনটি কারণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রথমত, গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোতে জনগণের প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হয়; দ্বিতীয়ত, এ শাসন ব্যবস্থা শাসিতের কাছে শাসকবর্গকে দায়িত্বশীল, সংবেদনশীল ও দায়বদ্ধ রাখে; তৃতীয়ত, এতে আইনের শাসন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়।[১] এ তিনটির কোনটির আপেক্ষিক গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সক্রিয়, সচল, কার্যক্ষম ও ফলপ্রসূ করার জন্য সবকটি বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি জরুরি। তবে এসবের মধ্যেও আনুপাতিক গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কেননা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যান্য বহিরাঙ্গন তথা কাঠামোগত বিন্যাস যতই সুন্দর ও কাম্য মানের হোক না কেন, এ ব্যবস্থা থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে হলে শাসন ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতা অপরিহার্য। শাসকবর্গের দায়িত্বশীলতা যে ব্যবস্থায় অনুপস্থিত তাকে আর যাই হোক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলার কোন সুযোগ নেই। এ ধরনের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের নামে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।[২]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দুটো পদ্ধতি, যথা- সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি চালু রয়েছে। উভয় পদ্ধতিতেই সরকারকে দায়িত্বশীল রাখার জন্য কিছু উপায়ের কথা বলা হলেও এর মধ্যে কোনটি অধিকতর দায়িত্বশীলতা সুনিশ্চিত করে তা নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। তবে জনগণের নির্বাচিত আইন সভার কাছে নির্বাহী বিভাগকে সরাসরি এবং সামষ্টিকভাবে দায়বদ্ধ রাখার বিধান সংসদীয় ব্যবস্থারই একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য। সে কারণে সাধারণভাবে দায়িত্বশীল সরকার বলতে সংসদীয় সরকারকেই বুঝানো হয়ে থাকে।[৩]

* সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হলেও আধুনিক বিশ্বে এটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য সরকার পদ্ধতি। পশ্চিমা ধাঁচে বা ব্রিটিশ মডেলের অনুকরণে পৃথিবীর অনেক দেশে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা প্রাপ্ত অনেক নতুন দেশে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে।[৪]

যে শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তাকে সংসদীয় সরকার বলা হয়। ব্যাপক অর্থে সংসদীয় সরকারের উপর্যুক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা সত্ত্বেও বর্তমানে এরূপ শাসন ব্যবস্থায় সংসদের প্রাধান্যের পরিবর্তে মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে অনেকে এরূপ শাসন ব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে অভিহিত করেন। আবার অনেক সময় এরূপ শাসন ব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা বা সংসদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা বলা হয়।[৫] ব্রিটেনে আমরা এ ধরনের সরকার দেখতে পাই। প্রধানমন্ত্রী ও কেবিনেটের সদস্যগণ তাদের কার্যাবলীর জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী। পার্লামেন্ট কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলে তাদের পদত্যাগ করতে হয়।[৬]

এ ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারিভাবে স্বীকৃত। এ ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন, যেমন- ব্রিটেনের রাণী বা ভারতের প্রেসিডেন্ট। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে এবং আইন সভার সমর্থনের উপর সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। এ পদ্ধতিতে সরকার আস্থা হারালে জোরপূর্বক দেশ শাসন করতে পারে না। সে জন্য অত্যন্ত সতর্কভাবে ক্ষমতাসীন দলকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়।

মন্ত্রিসভা সমষ্ঠিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আইন সভার নিকট দায়ী থাকে।[৭] মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা কার্যকর করার ক্ষেত্রে আইনসভা যে সব উপায় বা পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (Interpolations)[৮], মুলতবী প্রস্তাব (Adjournment motion)[৯], অনাস্থা প্রস্তাব (Vote of no-Confidence)[১০], ছাঁটাই প্রস্তাব (Cut-motion)[১১], সংসদীয় কমিটিসমূহের ভূমিকা (Parliamentary Committee)[১২], পার্লামেন্টারি কমিশনার (Parliamentary Commissioner)[১৩] ইত্যাদি।

পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থার (১৯৪৭-১৯৫৮) কার্যকারিতার প্রকৃত অবস্থা মূল্যায়নের চেষ্টা করাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। বর্তমান প্রবন্ধটি প্রধানত একটি পর্যবেক্ষণমূলক কাজ। এতে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য দলিলপত্রের মধ্যে রয়েছে- ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, পাকিস্তানের সংবিধান, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ ও প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সমন্বয়ে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১৪] স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান বিশেষত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারেই শাসিত হয়।[১৫] পাকিস্তান যেহেতু অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের সম-মর্যাদা অর্জন করে, সেহেতু পাকিস্তানও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার রীতি-পদ্ধতি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। সুতরাং পাকিস্তানে ১৯৪৭-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাই

কার্যকর ছিল। ফেডারেল আইনসভা বা পার্লামেন্ট জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়, সকল মন্ত্রীকে আইনসভার/পার্লামেন্টের সদস্য হতে হয় এবং সরকারের সকল নীতিতে আইনসভার স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব আইনসভার আস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল অর্থাৎ মন্ত্রিসভা প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার নিকট দায়ী ছিল। পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতেও অনুরূপ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।[১৬]

পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা (১৯৪৭-১৯৫৮)

১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশের পর কায়েদে-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন[১৭] এবং ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ্ লিয়াকত আলী খানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন।[১৮] কিন্তু কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওয়ার কারণে নয়, বরং জিন্নাহ্র দ্বারা মনোনীত হওয়ার কারণেই লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। জিন্নাহ্ অন্যান্য মন্ত্রীগণকেও নিয়োগ ও তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে জিন্নাহ্ কেবল অসাধারণ সাংবিধানিক ক্ষমতার অধিকারীই ছিলেন না, তিনি পাকিস্তানের স্রষ্টা হিসেবে চরম মাত্রায় রাজনৈতিক ক্ষমতাও ভোগ করেন। যদিও আইনগতভাবে গভর্নর জেনারেল পাকিস্তানের গণপরিষদের সম্মতি নিয়েই কেবল তার ক্ষমতা চর্চা করতে পারতেন, তথাপি গণপরিষদ কোন ক্ষেত্রেই জিন্নাহ্র কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি বা তাঁর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ বা ক্ষুণ্ন করতে উদ্যত হয়নি। আর এরূপ ঘটনার কোন সম্ভাবনাও ছিল না, কারণ কায়েদে-আজম গভর্নর জেনারেল হওয়া ছাড়াও তাঁকে গণপরিষদ ও কেন্দ্রীয় আইন সভা উভয় সংস্থারই সভাপতি নির্বাচন করা হয়। অধিকন্তু, জিন্নাহ্কে সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে গণপরিষদের আইনগত পথ নির্দেশক করা হয়। জিন্নাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কোন বিল পাস করার মত ধৃষ্টতা বা প্রবৃত্তিও গণপরিষদের বা কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যগণের ছিল না বললেই চলে। অধিকন্তু, আইনগতভাবে জিন্নাহ্ ব্রিটিশ সম্রাটের নামে কোন বিলে সম্মতি বিধান করবেন বলে প্রত্যাশা করা হয়, কিন্তু তিনি ব্রিটিশ সম্রাটের নামে বিলে সম্মতিদানের রীতি বাতিল করে দেন। জিন্নাহ্র বিরাট ব্যক্তিত্ব অন্যান্য সকল রাজনীতিকগণকে প্রায় গুরুত্বহীন করে তোলে। বস্তুত, পাকিস্তানের তৎকালীন সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি ও জিন্নাহ্র অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি গভর্নর জেনারেল হিসেবে প্রায় একনায়কসুলভ ক্ষমতা চর্চা করেন। মন্ত্রিসভা আহ্বান ও স্থগিত করা, মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ইত্যাদিসহ সমগ্র নির্বাহী-বিভাগীয় দায়িত্ব তিনি একচ্ছত্রভাবে পালন করেন।[১৯] তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণের ভূমিকা খুবই নগণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কিথ কালার্ড উল্লেখ করেন, মন্ত্রিসভা কর্তৃক গভর্নর জেনারেলকে নির্দেশদানের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। বস্তুত, তা অচিন্তনীয় ছিল। জিন্নাহ্ গণ-পরিষদেরও সভাপতি ছিলেন এবং তা ফেডারেল আইনসভা হিসেবে তাঁর কার্য ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কোন মনোভাবই দেখায় নি। এমনকি ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ এর পূর্বে ফেডারেল আইনসভা হিসেবে গণপরিষদ কোন অধিবেশনে বসেনি।[২০] মোট কথা, জিন্নাহ্ গভর্নর জেনারেলের পদ গ্রহণ করায় দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। তাঁর অধীনে মন্ত্রিপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ছিল খুবই কম। এর অন্যতম কারণ হল জিন্নাহ্র ব্যক্তিত্ব, সর্বোপরি তিনি জাতির পিতা বলে খ্যাত হবার পর মন্ত্রিসভা অনেকাংশে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।[২১]

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ্‌র মৃত্যু হলে পাকিস্তানে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার কার্যত প্রচলিত হওয়ার রাজনৈতিক সুযোগ ও পরিস্থিতি প্রথমবারের মত সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে তৎকালীন পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীনকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। দেশের প্রধান নেতা ও রাজনীতিবিদ লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থেকে যান এবং দেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এখন হতে গভর্নর জেনারেল নন বরং প্রধানমন্ত্রী নিজেই মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নতুন মন্ত্রীগণকে নিয়োগ এবং তাঁদের মধ্যে দপ্তর পুনর্বণ্টন করেন। তিনি সরকারকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, তবে জিন্নাহ্ যেরূপ তাঁর মন্ত্রীগণের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন, লিয়াকত আলী খান কিন্তু তাঁর সহকর্মী মন্ত্রীগণের ওপর সেরূপ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেননি। গভর্নর জেনারেল নাজিম উদ্দীনও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের রীতি-পদ্ধতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তিনি নিজের ক্ষমতাবলে নন বরং মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। নাজিম উদ্দীন ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম যথার্থ নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর জেনারেল।[২২]

কিন্তু লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের দু'অংশের জন্য গ্রহণযোগ্য কোন সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ফলে বাঙ্গালি ও পাঞ্জাবি রাজনীতিকগণের মধ্যকার বিরোধ তাঁর সময়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই দানা বেঁধে ওঠে।

তিনি এ বিরোধ মীমাংসা করতে কেবল ব্যর্থই হননি, অধিকন্তু ক্ষমতায় থাকার জন্য তিনি অনেক প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সাথে আপোষরফাও করেন। যা হোক, জিন্নাহ্‌র মৃত্যুর পর হতে ১৬ অক্টোবর ১৯৫১ লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে সংসদীয় রীতি-পদ্ধতির বিকাশ লাভের সুন্দর সুযোগই সৃষ্টি হয়। কিন্তু লিয়াকত আলীর মৃত্যু পাকিস্তানের সংসদীয় শাসন তথা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি মারাত্মক আঘাত হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিম উদ্দীন ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং আলোচনার সিদ্ধান্তক্রমে বাঙ্গালি নাজিম উদ্দীন নতুন প্রধানমন্ত্রী এবং পাঞ্জাবি অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ নতুন গভর্নর জেনারেল হন। ১৭ অক্টোবর ১৯৫১ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে খাজা নাজিম উদ্দীন ঘোষণা করেন, "মন্ত্রিসভা আজ আমাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন।" এ উক্তি অসংসদীয় ছিল, কারণ এতে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার নেতা নন বরং মন্ত্রিসভার মনোনীত ব্যক্তিতেই পরিণত হন। অবশ্য কিছু দিন পর প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সকল সদস্যের শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করে এ বিভ্রান্তিকর উক্তি সংশোধন করা হয়। তাছাড়া, "গভর্নর জেনারেল প্রাত্যহিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ হতে নিজেকে দূরে রাখবেন'-এ ঐতিহ্যও নাজিম উদ্দীনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ফলে কোনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।"[২৩]

নাজিম উদ্দীনের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাঁর নিজস্ব পছন্দমত নিযুক্ত হননি। কারণ লিয়াকত আলী খানের মন্ত্রিসভা ইতোপূর্বেই বিদ্যমান ছিল এবং এ মন্ত্রিসভার মধ্যে ব্যাপক রদ-বদল সাধন করা নাজিম উদ্দীনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি কেবল অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদের

পদত্যাগের পর শূন্য পদে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং সরদার নিশতারকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন। এ ছাড়া আর কোন পরিবর্তন নাজিম উদ্দীনের মন্ত্রিসভায় ঘটেনি।

গোলাম মোহাম্মদকে গভর্নর জেনারেল হিসেবে মনোনীত করার ফলাফল পাকিস্তানের সংসদীয় শাসনের পক্ষে সুখদায়ক হয়নি। সংসদীয় ঐতিহ্য ও রীতি পদ্ধতিতে তাঁর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা তো দূরের কথা, এর প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধাবোধও ছিল না। প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দীন ক্রমশ: তাঁর ক্ষমতা ব্যক্ত করতে থাকলে নতুন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এতে কোন বাধা দেননি বা আপত্তি প্রকাশ করেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোন বিরোধ বা মতানৈক্যও প্রকাশ করেননি এবং নিজের স্বাভাবিক এখতিয়ারের মধ্যেই কাজ করে যেতে থাকেন। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। কেন্দ্রীয় আইন-সভাতে বাঙ্গালি নেতৃবৃন্দ এবং পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রকটতর হতে থাকে। নাজিম উদ্দীন সরকার কর্তৃক উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে প্রকাশ্যভাবে সমর্থনদান এবং বাংলা-ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের অস্বীকৃতির ফলে পূর্ব-বাংলায় ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। দেশের খাদ্য সংকট ও বিদেশ হতে খাদ্য সংগ্রহ করতে সরকারকে বাধ্য করে। ১৯৫২-১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবের ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের আহমদিয়া বিরোধী বিক্ষোভ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংকট ও দ্বন্দ্ব-বিরোধ চলে, তা মোকাবেলা করার কার্যকর নেতৃত্ব দিতে নাজিম উদ্দীন ব্যর্থতারই পরিচয় দেন। কেবল প্রশাসনের উপরই নয়, বরং নিজের দল মুসলিম লীগের (তিনি যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন) উপরও তাঁর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

দেশের ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতিতে সরকারের দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণের অসামর্থ্যের প্রেক্ষিতে গভর্নর জেনারেল ও তাঁর বন্ধুগণ অত্যন্ত শংকিত ও ভীত হয়ে পড়েন।[১৪] গভর্নর জেনারেল নাজিম উদ্দীনের মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করলে নাজিম উদ্দীন এ নিম্নোল্লিখিত যুক্তিতে পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেন-

(ক) গভর্নর জেনারেল সম্পূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধান হওয়ায় মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করার কোন অধিকার আইন ও সংবিধান অনুসারে গভর্নর জেনারেলের নেই;

(খ) নাজিম উদ্দীনের মন্ত্রিসভার ওপর আইন সভার আস্থা পরিলক্ষিত হয়, কারণ মাত্র তের দিন পূর্বে আইনসভা এ মন্ত্রিসভার বাজেট পাস করে;

(গ) তাঁর মন্ত্রিসভার পশ্চাতে দেশের সমর্থন পরিলক্ষিত হয়।[১৫]

নাজিম উদ্দীন পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলে গভর্নর জেনারেল ১৭ এপ্রিল ১৯৫৩ দেশের সমস্যাদি মোকাবিলায় সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হওয়ার অজুহাতে নাজিম উদ্দীন মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন। নাজিম উদ্দীন মন্ত্রিসভার প্রতি গভর্নর জেনারেলের অসন্তোষ থাকতে পারে, কিন্তু এ মন্ত্রিসভার পশ্চাতে যে দেশের আইন-সভার সমর্থন পরিলক্ষিত হয়, তা সন্দেহাতীত। এতদ্‌সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নাজিম উদ্দীন মন্ত্রিসভার বরখাস্তকরণ দেশের সংসদীয় রীতি-পদ্ধতির মূলে কুঠারাঘাত করে। তাই কিথ কালার্ড উল্লেখ করেন, প্রথমত, গভর্নর জেনারেলের কার্যব্যবস্থার ফলে তাঁর নিরপেক্ষতার ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়, দ্বিতীয়ত, এর ফলে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের রীতি ও দলীয় সংহতি লঙ্ঘিত হয়, তৃতীয়ত, আইনসভাই যে সরকার সৃষ্টি ও তা টিকিয়ে রাখার ক্ষমতার অধিকারী - এ ঐতিহ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

গভর্নর জেনারেলের কার্যব্যবস্থা এ কথাই প্রতিপন্ন করে যে, আইনসভা নয় বরং গভর্নর জেনারেলই মন্ত্রিসভা সৃষ্টি ও ভেঙ্গে দেয়ার অধিকারী। এভাবে পাকিস্তানে সংসদীয় রীতি-নীতির বিকাশের পথে মারাত্মক বাধার সৃষ্টি করা হয়।[২৬]

অতঃপর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৭ এপ্রিল ১৯৫৩ বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন। মোহাম্মদ আলী বিগত ছ'বছর যাবৎ দেশে অনুপস্থিত এবং তিনি তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ওয়াশিংটন হতে দেশের অভিমুখে যাত্রা করার প্রাক্কালেও জানতেন না যে, এ যাত্রার শেষে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।[২৭] গভর্নর জেনারেল তাঁর আনুষ্ঠানিক ও নিয়মতান্ত্রিক ভূমিকা পরিত্যাগ করে কেবল প্রধানমন্ত্রীকেই নন বরং প্রধানমন্ত্রীর সকল মন্ত্রীগণকে পূর্বেই বাছাই করে রাখেন, তিনি মন্ত্রীগণের মধ্যে দপ্তরও বণ্টন করেন। সুতরাং মোহাম্মদ আলী দেখতে পান যে, তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে পূর্বেই বাছাই করা হয়েছে। যা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অসংসদীয় রীতিই ছিল। পূর্বতন মন্ত্রিসভার আটজন সদস্যকে এবং নতুন তিনজন সদস্যকে মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মোহাম্মদ আলী কেন্দ্রীয় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন না। গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নাজিম উদ্দীন মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়ার ফলে যে গভীর আইনগত ও সাংবিধানিক সমস্যাদি দেখা দেয়, তার প্রতিকার আদালতে নয় বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নিহিত ছিল।[২৮] গভর্নর জেনারেলের কার্যব্যবস্থা কেন্দ্রীয় আইন সভার কর্তৃত্বের প্রতিও চ্যালেঞ্জ প্রদান করে। কেন্দ্রীয় আইন-সভা নতুন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে এর নিজস্ব কর্তৃত্ব চর্চা করতে পারতো এবং এভাবে গভর্নর জেনারেলের কার্যব্যবস্থার প্রতি এর মতামত প্রকাশ করতে পারতো। কিন্তু আইনসভা ও মুসলিম লীগ কোনটিই তা করেনি বরং তারা নতুন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ও তাঁর মন্ত্রিসভার প্রতিই সমর্থন ব্যক্ত করে এবং মোহাম্মদ আলীকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। সুতরাং সংসদীয় রীতি-নীতি লঙ্ঘনের জন্য গভর্নর জেনারেলের সাথে মুসলিম লীগের সদস্যগণকেও দায়ী করা চলে।

মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তিনি ও তাঁর সমর্থক মন্ত্রীগণের সম্মতিক্রমে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নাজিম উদ্দীন মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া ও অনুচিতভাবে ক্ষমতা চর্চার ফলে কেন্দ্রীয় আইনসভার অনেক সদস্য ইতোপূর্বেই গভর্নর জেনারেলের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। মোহাম্মদ আলী সে সকল সদস্যের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলেন। কেন্দ্রীয় আইন সভা হিসেবে গণপরিষদ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ অধিবেশনে বসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সংশোধন করে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট ও সীমিত করে দেয়। নতুন সংশোধনী অনুসারে এখন হতে গভর্নর জেনারেল আর প্রধানমন্ত্রীকে মনোনীত করার অধিকারী হবেন না, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা গভর্নর জেনারেলের সন্তুষ্টিমত তাঁদের পদে বহাল থাকবেন না; অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার নিজস্ব ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের থাকবে না; মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকটই দায়ী থাকবে এবং আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের স্পষ্ট সমর্থন ভোগ করবেন।[২৯]

এদিকে, মোহাম্মদ আলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের খসড়া সংবিধান গণপরিষদে পেশ হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু গণপরিষদ কর্তৃক গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা সংকুচিত

করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গভর্নর জেনারেল এর প্রতিশোধস্বরূপ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪ গণপরিষদ ভেঙ্গে দেন। এর পরপরই গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলীকে পুনরায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং মোহাম্মদ আলী সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এ নতুন মন্ত্রিসভায় পূর্বতন মন্ত্রিসভার চারজন সদস্য ও নতুন চারজন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার পর মোহাম্মদ আলী যে সরকার গঠন করেন তার প্রতি সাংবিধানিক আইন বা রীতি-পদ্ধতির কোন অনুমোদন থাকেনি। এ মন্ত্রিসভাকে কোন প্রচলিত অর্থেই সংসদীয় মন্ত্রিসভা বলা চলে না, কারণ তখন গণ-পরিষদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় থাকায় এমন কোন আইনসভা ছিল না যার নিকট উক্ত মন্ত্রিসভা দায়ী থাকতো এবং যার সমর্থন ভোগ করতো। ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪ হতে ৭ জুলাই ১৯৫৫ পর্যন্ত স্থায়ী এ মন্ত্রিসভাকে 'গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের শাসন পরিষদ' হিসেবেই বর্ণনা করা চলে। মন্ত্রিসভা গভর্নর জেনারেলের নিকট দায়ী ও তাঁর দ্বারা অপসারণযোগ্য ছিল। একথাও উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রী গভর্নর জেনারেল কর্তৃক গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার বিষয়টি সমর্থন করে এবং নতুন মন্ত্রিসভা গঠনে ইচ্ছুক হয়ে প্রকারান্তরে সংসদীয় প্রতিষ্ঠান ও রীতি-নীতি বিনষ্ট করাকেই স্বাগত জানান।

গভর্নর জেনারেল কর্তৃক গণপরিষদ বাতিল ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। গণ-পরিষদের সাবেক সভাপতি মৌলভী তমিজুদ্দিন খান[৩০] সিন্ধু আদালতে গভর্নর জেনারেলের ঘোষণার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করেন। সিন্ধু আদালত গভর্ণর জেনারেলের ঘোষণাকে অবৈধ বলে রায় দেন।[৩১] কিন্তু পরে পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হয়।[৩২] যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গভর্নর জেনারেলকে নতুন গণপরিষদ গঠনের পরামর্শ দেন।

জুন ১৯৫৫ দ্বিতীয় গণপরিষদ নির্বাচিত হয়। এ পরিষদে মোট ৮০ জন সদস্য ছিলেন। তাদের মধ্যে ৪০ জন পূর্ব-বাংলার আইনসভা কর্তৃক এবং বাকী ৪০ জন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। এভাবে সংখ্যাগুরু পূর্ব-বাংলার ওপর সংখ্যাসাম্য চাপিয়ে দেয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম গণ-পরিষদে ৭৯টি আসনের মধ্যে ৪৪টি ছিল পূর্ব-বাংলার জন্য। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক সংখ্যাসাম্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু গণপরিষদের নির্বাচনে উভয় দলই অংশগ্রহণ করে। পূর্ব বাংলার ৪০টি আসনের মধ্যে শেরে বাংলার নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট ১৬টি, আওয়ামী লীগ ১৩টি, কংগ্রেস ৪টি, তফসিল ফেডারেশন ৩টি, ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি ২টি, মুসলিম লীগ ১টি এবং নির্দলীয় সদস্য ১টি আসন লাভ করেন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীই ছিলেন পূর্ববাংলা হতে নির্বাচিত একমাত্র মুসলিম লীগ সদস্য। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০টি আসনের মধ্যে ৩৫টি আসন লাভ করে মুসলিম লীগ।[৩৩] ৭ জুলাই ১৯৫৫ পশ্চিম পাকিস্তানের মারীতে দ্বিতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বসে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে এক চুক্তিতে পৌছে, যার শর্তগুলো হলো-

১. পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে একত্রিত করে একটি প্রদেশ গঠন;
২. প্রদেশসমূহকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান;
৩. সকল ক্ষেত্রে দু'অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যাসাম্য প্রবর্তন;
৪. যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন;
৫. বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান।[৩৪]

১৯৫৪ সালে পূর্ব-বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের চরম পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের অভূতপূর্ব বিজয়ের ফলাফলস্বরূপ দ্বিতীয় গণপরিষদে যুক্তফ্রন্টভুক্ত দলগুলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন লাভ করে। দ্বিতীয় গণপরিষদে দলগত অবস্থানের এরূপ পরিবর্তনের ফলে পূর্ব-বাংলার বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ১১ আগষ্ট ১৯৫৫ পদত্যাগ করেন। এদিকে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। নতুন গণপরিষদে মুসলিম লীগ সর্ববৃহৎ দল হলেও এর কোনরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের সাথে মৈত্রী জোটে উপনীত হতে সমর্থ হয়ে ১১ আগষ্ট ১৯৫৫ প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন। পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসে অসুস্থ গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ অবসর গ্রহণ করেন এবং জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা গভর্নর জেনারেল পদে আসীন হন।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলেই পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত ও বিধিবদ্ধ হয় এবং তা ১৯৬৫ বলবৎ হয়। এ সংবিধানের অধীনে জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা রাজনৈতিক বিষয়ে ও বিভিন্ন দলীয় কোন্দলে সর্বদাই নিজেকে জড়িত রেখে প্রেসিডেন্ট পদের নিরপেক্ষতা ও সম্মান ক্ষুণ্ন করেন।

রাজনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের তৎকালীন ষড়যন্ত্রময় জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হন। মুসলিম লীগ পশ্চিম-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ড: খান সাহেবের উপর হতে সমর্থন প্রত্যাহার করলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং তাঁর নিজের দল মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এদিকে ড: খান সাহেব 'রিপাবলিকান পার্টি' নামে একটি নতুন দল গঠন করলে, ইস্কান্দার মীর্জা সে দলের পশ্চাতে বিভিন্ন উপায়ে মদদ যোগাতে থাকেন। এরূপ পরিস্থিতিতে অতি সুকৌশলে ইস্কান্দার মীর্জা মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশনের মধ্যে ভাঙ্গনের সূচনা করেন। জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ মুসলিম লীগ সদস্য রিপাবলিকান পার্টিতে যোগদান করলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ পদত্যাগ করেন।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর পর হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভা হলো আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পূর্বে সোহ্‌রাওয়ার্দী জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের আহ্বায়কও ছিলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর অসামান্য ও গতিশীল ব্যক্তিত্বই নতুন মন্ত্রিসভার প্রধান লক্ষণীয় দিক ছিল। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা এক বছরের চেয়ে খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সোহ্‌রাওয়ার্দীর মত একজন শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিভাধর রাজনীতিক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার প্রতি চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেন। ফলে ইস্কান্দার মীর্জা সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রী থাকার বিষয়টি সুনজরে দেখেননি। এদিকে, কিছুসংখ্যক প্রভাবশালী রিপাবলিকান দলীয় সদস্য পশ্চিম-পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী দৃঢ়তার সাথে এক ইউনিট ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি প্রদেশ রাখার পক্ষেই প্রচার অভিযানে লিপ্ত হন। ফলে কিছু সংখ্যক রিপাবলিকান সদস্য সোহ্‌রাওয়াদীর মন্ত্রিসভার উপর হতে সমর্থন প্রত্যাহার করলে অক্টোবর ১৯৫৭ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা নাজুক অবস্থায় পতিত হয়। তখন সোহ্‌রাওয়ার্দী জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন ও

আস্থা ভোগ করেন কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার জন্য প্রেসিডেন্টকে তিনি পরামর্শ দেন। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দীর এ পরামর্শ প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা অগ্রাহ্য করেন। ইস্কান্দার মীর্জা সোহ্‌রাওয়ার্দীকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে বলেন, অন্যথায় তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীকে বরখাস্ত করবেন বলে জানিয়ে দেন। এরূপ বিকল্পহীন অবস্থায় সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৮ অক্টোবর ১৯৫৭ প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেন।

সোহ্‌রাওয়ার্দীকে জাতীয় পরিষদে তাঁর শক্তি-পরীক্ষার কোন সুযোগ না দিয়ে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে বাধ্য করে ইস্কান্দার মীর্জা স্পষ্টভাবেই সংসদীয় রীতি-পদ্ধতি লঙ্ঘন করেন। এও লক্ষণীয় যে, সোহ্‌রাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হতে অব্যাহতিদানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট তাঁর সিদ্ধান্ত একজন বিশিষ্ট রিপাবলিকান সদস্য মোজাফ্‌ফর আলী কিজিলবাসের মাধ্যমে জানান।[৩৫]

সোহ্‌রাওয়ার্দীর পর আই.আই.চুন্দ্রীগড়কে যখন কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানানো হয়, তখন চুন্দ্রীগড় বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। চুন্দ্রীগড় মুসলিম লীগ দলীয় নেতা ছিলেন এবং তিনি যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন তার পশ্চাতে রিপাবলিকান পার্টি, কৃষক-শ্রমিক দল ও নেজামে ইসলামী পার্টিরও ব্যাপক সমর্থন ছিল। এম.আহ্‌মদ মন্তব্য করেন, যে কোন মানদন্ড অনুযায়ীই চুন্দ্রীগড় একজন দুর্বল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যকে, এমন কি তাঁর নিজস্ব মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যকেও বাছাই করার ব্যাপারে তাঁর কোন বক্তব্য ছিল না। এমনকি মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির মধ্যেও তাঁর চেয়ে কর্তৃত্বশালী নেতা ছিলেন।

কিন্তু চুন্দ্রীগড় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাও পূর্ববর্তী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাগুলোর তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং দু'মাসের চেয়েও কম সময় স্থায়ী হয়। পাকিস্তানে পশ্চিম-পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রিপাবলিকান পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভার পতনের মূল কারণ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ব-বাংলায় মুসলিম লীগ এর সকল শক্তি হারিয়ে ফেলে। সুতরাং পশ্চিম-পাকিস্তানে রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি করা মুসলিম লীগ ও রিপাবলিকান পার্টি এদের নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষে অপরিহার্য বলে দেখতে পায়। মুসলিম লীগ দীর্ঘকাল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন থাকলে, তা পশ্চিম-পাকিস্তানে উত্তরোত্তর আরো শক্তিশালী হয়ে রিপাবলিকান দলের শক্তি বিনষ্ট করবে এ আশঙ্কায় রিপাবলিকান দল কেন্দ্রে মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখতে অনিচ্ছুক হয়। আর মুসলিম লীগও এর মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করার দিকেই মনোযোগ ও কর্মশক্তি নিয়োগ করে এবং শাসন সমস্যাদির প্রতি অবহেলা দেখায়।[৩৬] এ অবস্থায় রিপাবলিকান দল ও মুসলিম লীগের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিরোধ মীমাংসার বাইরে চলে যায় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৭ চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে।

আই.আই. চুন্দ্রীগড়ের পর মালিক ফিরোজ খান নুন ১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৭ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। নুন মন্ত্রিসভা রিপাবলিকান মন্ত্রিসভাই ছিল এবং আওয়ামী লীগের সমর্থনই একে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখে। কেন্দ্রে নুন মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করে আওয়ামী লীগ পূর্ব-বাংলায় এর নিজস্ব মন্ত্রিসভা বহাল রাখতে চায়। জনগণের মধ্যে অন্যান্য দলের ভিত্তি ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে রিপাবলিকান দলের প্রতি কোন সমর্থন বা ভিত্তি ছিল না।

ফিরোজ খান নুন ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে তাঁর একটা সমঝোতা বা মৈত্রী গড়ে ওঠে। পাকিস্তানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট পদে ফিরোজ খান নুনকে সমর্থন দানের আশ্বাসও সোহ্‌রাওয়ার্দী দেন বলে বিশ্বাস করা হয়। অধিকন্তু, নুন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রিপাবলিকান দলের উপর মীর্জার প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগ পূর্ব হতেই মীর্জার উপর বিক্ষুব্ধ ছিল। এদিকে ১১ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের শেষ তারিখ হিসেবে ধার্য করা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে নুন-সোহ্‌রাওয়ার্দী জোট যদি স্থায়ী ও সফল হয়, তাহলে মীর্জা পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পাননি। সুতরাং মীর্জা-নুন-সোহ্‌রাওয়ার্দী জোটকে সুনজরে দেখেননি। সাধারণ নির্বাচনের সর্বশেষ তারিখ ঘোষণা করা হলে রাজনৈতিক অস্থিরতাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট মীর্জা ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ দেশে সামরিক আইন জারি করলে নুন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। আর সে সঙ্গে পাকিস্তানের প্রথম বারের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থারও বিলুপ্তি ঘটে।[৩৭]

অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় আইনসভা (১৯৪৭-১৯৫৮)

১৯৪৭ সালে প্রথম গণপরিষদ গঠিত হয়। যার মূল দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করা। কিন্তু শাসনতন্ত্র রচনাকাল পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য দেশের কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে কার্য পরিচালনার দায়িত্বও এর উপর ন্যস্ত থাকে। আইনসভা হিসেবে এর দায়িত্ব থাকে সরকার নিয়ন্ত্রণ ও সমর্থন করা, আইন প্রণয়ন করা এবং বাজেট পাস করা। তত্ত্বগতভাবে, গণ-পরিষদে কোন সরকার বা সরকার-বিরোধী দল থাকে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভারূপে কার্য করায় কেন্দ্রীয় সরকার তথা মন্ত্রিসভা এ পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ আইনসভা ক্ষমতাশালী হতে পারেনি, মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম এ সভায় হয়নি, যা চলে গণ-পরিষদে। এর প্রধান কারণগুলো হলো এ গণ-পরিষদ আইন প্রণয়নের কার্যকে দ্বিতীয় পর্যায়ের মনে করে; নেতৃস্থানীয় সদস্যগণ অন্য বহুবিদ কাজে লিপ্ত থাকেন, সরকারি পদে নিয়োজিত থাকেন; পরিষদে সরকারি দলের অত্যধিক সংখ্যাধিক্য থাকে। সুতরাং বিরোধী দল কর্তৃক কোন বিকল্প (Alternative) মন্ত্রিসভার সম্ভাবনা থাকেনি। মন্ত্রিসভার ওপর একমাত্র নিয়ন্ত্রণ থাকে পরিষদে প্রশ্ন উত্থাপন প্রথা। কিন্তু প্রশ্নের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা হয়; পরিষদের খুব কম অধিবেশন হয় এবং অধিবেশন খুব স্বল্পকালীন হয়। সর্বোপরি, দলীয় শৃঙ্খলা, অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনহেতু এবং শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব ও বিকল্প সরকারের সম্ভাবনাহীনতার ফলে মন্ত্রিসভাই আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে; মন্ত্রিসভার উপর আইন সভার প্রভাব থাকে অকিঞ্চিৎকর।

মোটকথা, এ অন্তর্বর্তী আইনসভা স্বীয় মর্যাদা রক্ষায় ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়। এর কারণগুলো কিথ্ কালার্ড অত্যন্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করেন: "ইহা জাতীয় আইনসভা হিসেবে অত্যন্ত ক্ষুদ্রসভা ছিল এবং এর অধিকাংশ সদস্য অন্য প্রকারের সরকারি পদে ও দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এটি জাতির প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের অধিকার হারিয়ে বসে; এবং দিনে দিনে জনসমর্থন হারাতে থাকে: এ সভায় বিরোধীদল অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও প্রভাবহীন ছিল। সরকার এ সভাকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করতো না। এর অধিবেশন ক্ষমতাশালীদের খুশি খেয়ালমত স্বল্পকালীন হতো এটা যেন সদস্যদের অবসর কাটানোর স্থান ছিল, মন্ত্রিসভা গঠনে ও বাতিলে এর কোন হাত ছিল না।"

কিন্তু দ্বিতীয় গণপরিষদ তথা পার্লামেন্টের প্রকৃতি ও আকার প্রথম পরিষদ হতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। দ্বিতীয় গণপরিষদে তিনটি প্রধান দল ছিল, যথা- আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট। পরে মুসলিম লীগের একটি অংশ 'রিপাবলিকান' দল গঠন করে। দ্বিতীয় গণপরিষদের আমলে সরকারের উত্থান-পতনে পরিষদই প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়, এতে একক কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠ না থাকায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করতে হয়। বিভিন্ন দলগুলোর অস্থিরতা ও জোট পরিবর্তনের ফলে মন্ত্রিসভার ঘন ঘন উত্থান-পতন ও রদবদল হয়। তদুপরি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক দলাদলিতে ইন্ধন যোগানের ফলে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের আড্ডায় পরিণত হয়। সরকারের উত্থান-পতন ঘটতো আইন পরিষদে নয়, প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী পার্লামেন্টারি শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এ চক্রান্তে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অপসারিত হন। ১৯৫৬ এর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পরিষদের ভিতরে ও বাইরে ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এর সুযোগে ও অজুহাতে ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং শাসনতন্ত্র ও শাসনতান্ত্রিক শাসন তথা পার্লামেন্ট ও সরকার বাতিল করা হয়।[৩৮]

পূর্ব-পাকিস্তানে (পূর্ব-বাংলায়) সংসদীয় সরকার

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় প্রদেশগুলোর ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা, রাজনীতিকগণের ক্ষমতালিপ্সা, ষড়যন্ত্র-প্রবণতা, সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অভাব, গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় রীতি-নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুচিত হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার কার্যকারিতা নৈরাশ্যজনকই হয়। পূর্ব-বাংলার ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে সরকারগুলো অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর হয়।

জনসংখ্যার দিক দিয়ে পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে (১৯৪৬ সালে নির্বাচিত) মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। সুতরাং উক্ত দলের নেতা খাজা নাজিম উদ্দীন ১৯৪৭ সালে পূর্ব-বাংলার প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তখন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ একজন ইংরেজ স্যার ফ্রেডারিক বের্নকে (Sir Frederick Bourne) পূর্ব-বাংলায় প্রথম গভর্নর নিয়োগ করেন। নাজিম উদ্দীন পূর্ব-বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পূর্ব-বাংলার প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বাঙ্গালিদের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে 'কেবল উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হবে' বলে জিন্নাহ্ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী নাজিম উদ্দীন নিজে বাঙ্গালি হওয়া সত্ত্বেও জিন্নাহ্‌র বক্তব্যকে সমর্থন করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির বিরোধিতা করেন।

সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ জিন্নাহ্‌র মৃত্যু হলে নাজিম উদ্দীন পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। পূর্ব-বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যগণ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করার জন্য একজন নেতা নির্বাচন করতে চান। কিন্তু তাঁরা এরূপ নেতা নির্বাচনের কোন সুযোগ পাননি।[৩৯] কারণ একজন প্রাদেশিক মন্ত্রী নূরুল আমীনকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করার জন্য গভর্নর জেনারেল পূর্ব-বাংলার গভর্নরকে নির্দেশ দেন। ফলে নূরুল আমীন সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। গভর্নর

জেনারেলের এ কার্যব্যবস্থা সংসদীয় রীতি-নীতির লঙ্ঘনস্বরূপই ছিল। অবশ্য, এর ফলে আওয়ামী লীগ গঠনের সময় অসন্তুষ্ট মুসলিম লীগ সদস্যগণের সমর্থন লাভ করা সোহ্‌রাওয়ার্দীর পক্ষে সহজসাধ্য হয়।

পূর্ব-বাংলায় নূরুল আমীন মন্ত্রিসভা ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত স্থায়ী এবং তা স্থিতিশীল হয়। কিন্তু তখন পূর্ব-বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব-বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণের ফলে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পায়। পূর্ব-বাংলায় পূর্ণ-প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপিত হয়। সর্বশেষে, নূরুল আমীন পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়েই ১৯৫২ সালে পূর্ব-বাংলায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

পূর্ব-বাংলার জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও সরকার-বিরোধী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে নূরুল আমীন মন্ত্রিসভা ভীত হয়ে পড়ে। ১৯৪৯ সালে প্রাদেশিক পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনের উপ-নির্বাচনে নূরুল আমীন সরকারের প্রার্থী পরাজিত হওয়ার পর, এ সরকার প্রাদেশিক পরিষদের ১৭১টি আসনের মধ্যে ৩৪টি আসনই শূন্য থাকা সত্ত্বেও সে সকল আসন পূরণের জন্য উপ-নির্বাচন দিতে অস্বীকার করেন। যা গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি লঙ্ঘনের স্পষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। এমনকি ১৯৪৬ সালে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের পাঁচ বছরব্যাপী মেয়াদকাল স্বাধীনতা লাভের পর এর প্রথম অধিবেশনের সময় হতে ধরেও পরিষদকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কাজ করতে দেয়া হয়। এর পরও নূরুল আমীন সরকারের অনুরোধক্রমে গণপরিষদ পূর্ব-বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার মেয়াদ আরো এক বছরের জন্য বৃদ্ধি করে। এতেও নির্বাচকমন্ডলীর মোকাবেলা করতে নূরুল আমীন মন্ত্রিসভার অনীহাই প্রকাশ পায়।

নূরুল আমীন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে পূর্ব-বাংলায় দু'জন অ-বাঙ্গালি গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ১৯৫০ সালে মালিক ফিরোজ খান নুন এবং ১৯৫৩ সালে চৌধুরী খালিকুজ্জামান এ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন।

১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব-বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করে এবং মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি ঘটে। যুক্তফ্রন্টের প্রধান প্রধান অঙ্গদলগুলো ছিল- আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম।[৪০]

নির্বাচনে পরাজয়ের ফলে নূরুল আমীন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবে ফজলুল হক এপ্রিল ১৯৫৪ পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন এবং তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এর ফলে পূর্ব-বাংলায় সাত বছরব্যাপী মুসলিম লীগের একচ্ছত্র শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসার পর পরই পূর্ব-বাংলার শিল্প এলাকাগুলোতে বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা সংঘঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট অভিযোগ করে যে, নতুন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই সুপরিকল্পিতভাবে এ দাঙ্গা সংঘটন করা হয়। প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার দু'মাস পর ২৯ মে ১৯৫৪ পূর্ব-বাংলার ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন এবং এ প্রদেশের উপর গভর্নরের শাসন জারি করেন। প্রাদেশিক পরিষদকে অধিবেশনে মিলিত হতে দেয়া হয়নি। গভর্নরের কার্যভার গ্রহণের জন্য মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে করাচী হতে পূর্ব-বাংলায় প্রেরণ করা হয়।

পূর্ব-বাংলায় গভর্ননের শাসন ২ জুন ১৯৫৫ পর্যন্ত বহাল রাখা হয়। ইতোমধ্যে অক্টোবর ১৯৫৪ ইস্কান্দার মীর্জা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করার জন্য করাচীতে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর প্রথম স্যার টমাস ইলিস এবং তার পর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন পূর্ব-বাংলার অস্থায়ী গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৪১]

পূর্ব-বাংলায় গভর্নরের শাসন চলাকালে যুক্তফ্রন্ট দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীনে আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট হতে পৃথক হয়ে পড়ে এবং ফজলুল হক তখনো যুক্তফ্রন্টের অবশিষ্টাংশের নেতা থেকে যান। উভয় দলই প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। কারণ উভয় দলই মন্ত্রিসভা গঠনের মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে বলে দাবি করলেও, কোন দলকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দান করা হবে, তা কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করবে।

যা-হোক, দীর্ঘ এক বছর পর পূর্ব-বাংলায় সংসদীয় শাসন পুনঃপ্রবর্তিত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্যপদে সোহ্‌রাওয়ার্দী আসীন থাকা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট নেতা ফজলুল হক কেন্দ্রীয় সরকারের আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হন। ফজলুল হকের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবু হোসেন সরকার জুন ১৯৫৫ পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

এও স্পষ্ট যে, অ-মুসলমান সদস্যগণের উল্লেখযোগ্য সমর্থন ব্যতিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলো যুক্তফ্রন্টের প্রতি অব্যাহতভাবে অনুগত না থাকলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পক্ষে প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভোগ করা কোন ক্রমেই সম্ভব হতো না।[৪২]

কংগ্রেস দলীয় সদস্যগণ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস, তফশিলী সম্প্রদায় ও ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্যগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরূপ বিভিন্নমুখী দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা এক বছর তিন মাস স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রাদেশিক আইনপরিষদে এ মন্ত্রিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা ও সমর্থন ভোগ করে কিনা, তা বিচার করার জন্য এ মন্ত্রিসভা উক্ত পরিষদের কোন অধিবেশন আহবান করতে অস্বীকার করে। এরূপ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে উক্ত মন্ত্রিসভা সংসদীয় রীতি-নীতি মারাত্মকভাবে লঙ্ঘন করে।

পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফজলুল হক ৫ মার্চ ১৯৫৬ পূর্ব-বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। উক্ত মার্চ মাসে পূর্ব-বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কিন্তু সংক্ষিপ্ত নোটিশদানের কারণে পরিষদের স্পিকার বাজেট বিবেচনার জন্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ফলে প্রাদেশিক আইন পরিষদের উক্ত অধিবেশনে বাজেট পাস করে নিতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ব্যর্থ হয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে টিকে রাখার উদ্দেশ্যে গভর্নর প্রাদেশিক আইন সভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। শুধু তাই নয়, প্রাদেশিক সরকার সংবিধান অনুসারে চলতে পারছে না এ অজুহাতে জরুরি ক্ষমতাবলে পূর্ব-বাংলার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন বলবৎ করা হয়। কিছুদিন পর কেন্দ্রীয় শাসন প্রত্যাহার করে আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাই পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতেও শাসনের স্বাভাবিক রীতি-নীতি স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করা হয়। কারণ, যখন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা আইনপরিষদে বাজেট পাস করাতে ব্যর্থ হয় তখন বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন এবং আইনসভায় এর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের সুযোগ দেয়া উচিত ছিল।

ইত্যবসরে, স্থানীয় ও জাতীয় প্রশ্নে মতানৈক্যের কারণে চারটি ক্ষুদ্র দল-গণতন্ত্রী দল, কংগ্রেস, তফশিলী জাতি ফেডারেশন ও ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হতে এদের সমর্থন প্রত্যাহার করে। ফলে স্পষ্টত যুক্তফ্রন্ট খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে এবং সরকার মন্ত্রিসভা আইনপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। আওয়ামী লীগও আবু হোসেন সরকারের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পরাজিত করার মত যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে। অন্যান্য দলের সমর্থন বঞ্চিত কৃষক শ্রমিক দলীয় মন্ত্রিসভার পতন স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে আগষ্ট ১৯৫৬ প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কিন্তু উক্ত আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়ে সরকার মন্ত্রিসভা পরাজিত হবে সুনিশ্চিত ছিল। সুতরাং, উক্ত মন্ত্রিসভা টিকিয়ে রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে গভর্নর উক্ত পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এতেও সরকার মন্ত্রিসভা কর্তৃক সংসদীয় রীতি-নীতির প্রতি চরম অশ্রদ্ধাবোধই প্রমাণিত হয়।

অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে ও চাপের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালের শেষ দিকে সরকার মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। এর ফলে এমন এক সরকারের অবসান ঘটে, যা সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুন সুপরিকল্পিতভাবে লঙ্ঘন করার জন্য কুখ্যাত ছিল।[৪৩]

অতঃপর ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ প্রাদেশিক আইন-পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা আতাউর রহমান খান (আওয়ামী লীগ) পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন এবং নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। যা স্পষ্টতই সংসদীয় রীতি-পদ্ধতির অনুসারী ছিল।[৪৪] তাঁর মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস ও গণতন্ত্রী দলীয় সদস্যগণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর পরই ১২ সেপ্টেম্বর রিপাবলিকানদের সমর্থন সহযোগে সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রেও ক্ষমতাসীন হয়। প্রাদেশিক আইন-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হলে আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ১৪৩-৮৫ ভোটে আইন সভার আস্থা অর্জনে সমর্থন হয়।

কিন্তু আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে শীঘ্রই দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দীর পাশ্চাত্যপন্থী বৈদেশিক নীতির সাথে মতানৈক্য হওয়ার কারণে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং জুলাই ১৯৫৭ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন। তখন প্রাদেশিক পরিষদের কিছু সংখ্যক (২৮ জন) আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যও আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ভাসানীর নব গঠিত ন্যাপ দলে যোগদান করেন। এতে প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বে হুমকী দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের সাথে মৈত্রীজোটে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদের কয়েকজন আওয়ামী লীগ দলীয় ও গণতন্ত্রী দলীয় সদস্য আতাউর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ কংগ্রেস মন্ত্রিসভার উপর হতে সমর্থন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে এ মন্ত্রিসভা প্রাদেশিক পরিষদে বাজেট পাস করিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। ক্ষমতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে এ মন্ত্রিসভা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্য গভর্নরকে পরামর্শ দান করে। কিন্তু গভর্নর উক্ত মন্ত্রিসভা ইতোমধ্যে আইন পরিষদের আস্থা হারিয়ে ফেলার কারণে এর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করে

অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি ৩১ মার্চ ১৯৫৯ আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন এবং সাবেক মুখ্যমন্ত্রী কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসনে সরকারকে নতুন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তখন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ফিরোজ খান নুনের মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় ছিল। স্বভাবতই আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে পূর্ব-বাংলায় টিকে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গভর্নরকে অবিলম্বে বরখাস্ত করেন এবং আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভাকে প্রদেশে পুনরায় বহাল করা হয়। কিন্তু আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভা প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ছিল না।

কিন্তু আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভা প্রদেশে আর বেশিদিন টিকতে পারেনি। ১৮ জুন ১৯৫৮ যখন কিছু সংখ্যক হিন্দু সদস্য ও ন্যাপ দলীয় সদস্য মন্ত্রিসভার উপর হতে সমর্থন প্রত্যাহার করেন, তখন প্রাদেশিক পরিষদে কয়েক ভোটে আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার পরাজয় ঘটে। উক্ত দিবসে কৃষক-শ্রমিক দলের আবু হোসেন সরকারকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করার আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু এ কৃষক-শ্রমিক দলীয় মন্ত্রিসভা এক সপ্তাহও স্থায়ী হয়নি। আওয়ামী লীগ নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি ও পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলের সপক্ষে কাজ করে যেতে সম্মত হয়ে ন্যাপের সাথে একটা সমঝোতায় উপনীত হয়।[৪৫] ন্যাপের দলীয় সদস্যগণের সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগ ২২ জুন ১৯৫৮ প্রাদেশিক পরিষদে কিছু ভোটের ব্যবধানে সরকার মন্ত্রিসভাকে পরাজিত করে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমানকে মন্ত্রিসভা গঠন করার সুযোগ দেয়া হয়নি। তৎপরিবর্তে জরুরি ক্ষমতাবলে প্রদেশের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন জারি করা হয়।

আগষ্ট ১৯৫৮ এর শেষ দিকে কেন্দ্রীয় শাসন প্রত্যাহার করা হয়। ২৫ আগষ্ট আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলা হয়। ফলে আওয়ামী লীগ আবার পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন হয়। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে সরকার পক্ষ পরিষদের স্পিকারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তার আনয়ন করেন এবং তা প্রধানত এ কারণে যে, স্পিকার বিরোধী দলকে সমর্থন করছেন বলে সরকারি পক্ষ সন্দেহ পোষণ করছিলেন। এ অধিবেশনে তখন চরম বিশৃঙ্খলা এবং সরকারি ও বিরোধী পক্ষের সদস্যগণের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মারামারি শুরু হয়ে যায়। এ ঘটনায় স্পিকারকে মারধর ও বহিষ্কার করা হয়। অতঃপর ২৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের সদস্য ও ডেপুটি স্পিকার পরিষদের অধিবেশনে কার্য পরিচালনার জন্য আগমন করলে তাকে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বেদম মারধর এবং মারাত্মকভাবে আহত করেন। কিছুদিন পর তিনি এ আঘাত জনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে আইন প্রণেতাগণ আইন লঙ্ঘনকারীতে পরিণত হন।[৪৬] প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যগণের এরূপ আচরণ অত্যন্ত অশোভন ও ঘৃণার্হ্য ছিল। এভাবে পূর্ব- বাংলায় সংসদীয় শাসন তামাসায় পরিণত হয়।

একই বছর ৭ অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হলে কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় পূর্ব-বাংলায়ও সংসদীয় শাসনের অবসান ঘটে।

পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতার (১৯৪৭-১৯৫৮) পর্যালোচনা

১৯৪৭-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনকই ছিল। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোতে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন ও রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা এক

হতবুদ্ধিকর ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর কেন্দ্রে সাত বছরের মধ্যে ছ'বার মন্ত্রিসভা বা সরকারের পতন ঘটে। বস্তুত, সংসদীয় ব্যবস্থার বিকাশ সাধনের ব্যর্থতাই পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতকে তিমিরাচ্ছন্ন করে তোলে।

লিয়াকত আলী খানের পর সরকার-প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক মর্যাদা অপরিবর্তিত থাকলেও, আইনসভা আর ক্ষমতার উৎস থাকেনি, মন্ত্রিসভা গঠনের কর্তৃত্বদানের ক্ষমতা ও মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা আইনসভার বাইরে চলে যায়। গভর্নর জেনারেলই তাঁর ইচ্ছামত কোন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী করার বা প্রধানমন্ত্রীর পদ হতে অপসারণ করার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। কোন ব্যক্তিকে আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভোগী নেতা হওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়নি। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী আইন-সভার নিকট হতে তাঁর কর্তৃত্ব লাভ করেননি বা তিনি গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত থেকে তাঁর ক্ষমতা চর্চা করতে পারেননি। প্রায় ক্ষেত্রেই গভর্নর জেনারেল প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রীগণকে পূর্বেই বাছাই করে রাখেন। প্রধানমন্ত্রী আইনসভার দ্বারা নয় বরং গভর্ণর জেনারেলের ইচ্ছানুযায়ী উক্ত পদে নিযুক্ত হন এবং প্রধানমন্ত্রী গভর্নর জেনারেলের সন্তুষ্টি মত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ফলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব দিতে পারেননি বা তাঁর সহকর্মী মন্ত্রীগণের আস্থা ও আনুগত্য অর্জন করতে পারেননি। গভর্নর জেনারেল যখন প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করেন, তখন মন্ত্রীগণও প্রধানমন্ত্রীকে ত্যাগ করে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত নতুন প্রধানমন্ত্রীর সাথে যোগদান করেন। গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক নাজিম উদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হতে বরখাস্ত করার ও মোহাম্মদ আলীকে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ঘটনা হতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পরোক্ষভাবে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় আইনসভাও আর জনগণের আস্থাভাজন প্রতিনিধি ও জনগণের নিকট দায়ী থাকেনি। ফলে কেন্দ্রীয় আইনসভা গভর্নর জেনারেলের স্বেচ্ছাচারী আচরণকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। গভর্নর জেনারেল এতোই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করার সময় তাঁকে আইনসভায় তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার সুযোগ দেননি। এভাবে প্রতিটি সংসদীয় রীতি-পদ্ধতিকে অবমূল্যায়ন করা হয়।

১৯৫৬ সালের সংবিধান বিধিবদ্ধ হওয়ার পর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাবহেতু চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার বিকাশ সাধনে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় আইন-সভায় কোন দলেরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় কোয়ালিশন সরকার গঠনের পালা শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ইস্কান্দার মীর্জা তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন দল বা কোয়ালিশনকে সমর্থন করেন। বিশেষত তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানের রিপাবলিকান দলকে পৃষ্ঠপোষকতা করে ও ইচ্ছেমত কাজে লাগিয়ে নিজের সুবিধামত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাগুলো ভেঙ্গে দেন। আইনসভায় রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্বল অবস্থা ও রাজনীতিতে প্রেসিডেন্ট মীর্জার হস্তক্ষেপের ফলে প্রধানমন্ত্রীদের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন হয়। তাছাড়া, মন্ত্রিসভাগুলো অপরিহার্যভাবেই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হওয়ায় মন্ত্রিসভাতে প্রধানমন্ত্রী কার্যকরভাবে নেতৃত্ব দিতে পারেননি। সকল মন্ত্রীকে বাছাই করার ক্ষমতা ও মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদানের ক্ষমতাও প্রধানমন্ত্রীর ছিল না।

অতঃপর সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সংসদীয় ব্যবস্থার বিকাশ লাভে কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি হবে প্রত্যাশা করা হলেও এবারও প্রেসিডেন্ট মীর্জা সুকৌশলে সোহ্‌রাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার ওপর হতে রিপাবলিকান সদস্যগণের সমর্থন প্রত্যাহার করান। অতঃপর ইস্কান্দার মীর্জা সোহ্‌রাওয়ার্দীকে আইনসভাতে তাঁর শক্তি পরীক্ষার সুযোগ না দিয়েই প্রধানমন্ত্রীর পদ হতে অপসারণ করেন। এতে সংসদীয় রীতি-নীতির বিকাশ মারাত্মকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রধান মন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার পর যে সকল ক্ষণভঙ্গুর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তাতে সংসদীয় শাসনের বিকাশের সামান্যই সুযোগ ছিল।

পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা হতে এও প্রমাণিত হয় যে, রাজনীতিকগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো সংসদীয় রীতি-পদ্ধতির প্রতি সামান্যই শ্রদ্ধা দেখান। তাঁরা নিজস্ব স্বার্থ অর্জনের জন্য যে কোন সময়েই এ সকল রীতি-পদ্ধতি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। তাঁদের ক্ষমতালিপ্সা ও দুর্বলতার কারণে তাঁরা গভর্নর জেনারেল ও প্রেসিডেন্টের ক্রীড়নকে পরিণত হন। দলের প্রতি সেবার পুরস্কার স্বরূপ নয়, বরং পারস্পরিক স্বার্থসাধনেই মন্ত্রিসভার সদস্যপদ দান করা হয়। অধিকাংশ মন্ত্রীগণই জনগণের আস্থাভাজন ছিলেন না এবং তাঁরা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয়ে সাধারণ নির্বাচন মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিলেন না।[৪৭]

দেশের গণ-পরিষদ সাত বছরের মধ্যেও দেশকে সংবিধান প্রদানে ব্যর্থ হয়। এ দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে গণ-পরিষদ আর জনগণের আস্থাভাজন প্রতিনিধি থাকেনি। এটি আইনসভা হিসেবে দেশে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়, মন্ত্রিসভার ওপর এর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয় নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে নয়, বরং আইনসভার সদস্যগণকে মন্ত্রিত্বপদ ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দান করে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন লাভ করেন। ক্ষমতা, পদ ও সুযোগ-সুবিধার লোভে আইন-সভার সদস্যগণ রাতারাতি তাঁদের আনুগত্য ও মতবাদ পরিবর্তন করেন। এরূপ অস্থির পরিবেশে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন' তামাসায় পরিণত হয় এবং সকল ধরনের দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অদক্ষতার সৃষ্টি হয়।

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রায় সংসদীয় ব্যবস্থার কিছু অভিজ্ঞতা হতে স্বাধীনতাত্তোর কালে পাকিস্তান পূর্ণ সংসদীয় ব্যবস্থার শাসন প্রবর্তন করে। কিন্তু স্বল্প অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ১৯৪৭-১৯৫৩ সালের রাজনৈতিক প্রশান্তির মধ্যে পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থার যে সফল ও যুক্তিসঙ্গত পরীক্ষা চলে, এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। এ সময়ের প্রথমার্ধে গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ্ সাহেবের প্রতাপাধিপত্যে যদিও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ক্ষুণ্ন হয়, তবুও তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব নতুন রাষ্ট্র গঠনে জনসাধারণের নিকট অনুপ্রেরণার উৎস ছিল, বিধায় মন্ত্রিসভা স্বদিচ্ছায়ই তাঁর একচ্ছত্র প্রভুত্ব মেনে নেন। কিন্তু জিন্নাহ্ সাহেবের অবর্তমানে ক্ষমতালিপ্সু গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের হাতে সংসদীয় ব্যবস্থা ক্রমাবনতিশীল অবস্থায় ১৯৫৮ সালে স্বৈরতন্ত্রের সর্বগ্রাসী আঁতাতে পতিত হয়।[৪৮]

১৯৪৭-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়ে, পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় নীতি স্বীকৃত হয়-এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু প্রশ্ন হলো বাস্তবে এ নীতি কতটুকু কার্যকরী হয়। এ প্রশ্নের সঠিক মূল্যায়নের ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কারো মতে সংসদীয় ব্যবস্থা পাকিস্তানে ব্যর্থ হয়। ১৯৬০ সালে নিযুক্ত সংবিধান কমিশন এ মতের সমর্থন করেন। অপর পক্ষে, পাকিস্ত

ানের রাজনীতির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত প্রাক্তন রাজনৈতিক এবং ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণের মতে পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থার যথোপযুক্ত পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হয়নি। এখানে ধারাবাহিকভাবে এ মতভেদের সমীক্ষা সাপেক্ষে পাকিস্তানে সংসদীয় সরকারের কার্যকারিতা সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করা হলো:

১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক নিযুক্ত সংবিধান কমিশনের মতানুযায়ী পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার সপক্ষে কমিশন কতিপয় কারণের উল্লেখ করেন, যথা- প্রথমত: সুষ্ঠু নির্বাচনের অভাব এবং বিগত সংবিধানের দোষত্রুটি; দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্র প্রধানদের মন্ত্রিসভা ও রাজনৈতিক দলগুলোর কাজে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রাদেশিক সরকারের কাজে অহেতুক হস্তেক্ষেপ; তৃতীয়ত: উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দলের অভাব, রাজনীতিবিদদের সাধারণ চরিত্রহীনতা এবং শাসনকার্যে তাদের অহেতুক হস্তক্ষেপ।[৪৯]

কিন্তু অনেক রাজনীতিক এ মত ব্যক্ত করেন যে, পাকিস্তানে সংসদীয় শাসনকে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষ-নিরীক্ষা করার সুযোগ দেয়া হয়নি। মুসলিম লীগের জনাব নূরুল আমীন বলেন, "To say that Parliamentary pattern of democracy had failed in Pakistan would be too hasty a verdict because the constitution was not given a fair trial." তিনি আরো বলেন, "It is the action of the late Mr. Golam Mohammad and his successors more than any body else which caused damage to the Parliamentary system and did not allow it to function properly." তবে এ কথাই সত্য যে, পাকিস্তানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি-নীতি উপযুক্ত বিকাশ ও শ্রদ্ধালাভে ব্যর্থ হয়।[৫০]

উপসংহার

পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে সংবিধান কমিশনের সমীক্ষা ও রাজনীতিবিদদের মতামত হতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, অন্তর্বর্তী কিংবা ১৯৫৬ সালের সংবিধানের অধীনে সংসদীয় ব্যবস্থা সন্তোষজনকভাবে কাজ করেনি। এ ব্যাপারে কমিশন রাজনীতিবিদগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে দোষী করেন এবং রাজনীতিবিদগণ গভর্নর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ, ইস্কান্দার মীর্জা ও স্থায়ী বেসামরিক কর্মচারীদেরকে অভিযুক্ত করেন। অবশ্য এ সময়ে দেশে যে মারাত্মক ধরনের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ছিল সে ব্যাপারে কমিশন ও রাজনীতিবিদগণ একমত পোষণ করেন।

সাবেক পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, রাষ্ট্রপ্রধানদ্বয় একটির পর একটি মন্ত্রিসভা, গণ-পরিষদসহ প্রশাসনে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিকে পদদলিত করে যতটুকু দোষী হন, অনুরূপভাবে রাজনৈতিক দলগুলো তাঁদের এ জাতীয় গণতন্ত্র বিরোধী কাজে সমর্থন যুগিয়ে এবং জনস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে দলীয় স্বার্থ/ব্যক্তিগতস্বার্থ উদ্ধারের যে তৎপরতা চালায় রাজনৈতিক দলগুলো তাতে রাষ্ট্রপ্রধানদের চেয়ে কোন অংশেই কম দোষী নয়। এ বক্তব্য হতে এ সত্যে পৌঁছা যায় যে, পাকিস্তানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এমন মারাত্মকভাবে চলতে থাকে, যার দরুন ব্রিটেন কিংবা কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানে সংসদীয় ব্যবস্থার যথাযথ পরীক্ষা হবার মত পরিবেশের বিকাশ সাধন সম্ভব হয়নি। ক্ষমতার মোহই এখানে সংসদীয় ব্যবস্থা বিকাশের পথে একটি মারাত্মক অন্তরায় ছিল। পরিশেষে Arnold Toynbee-র মত উদ্ধৃত করে বলা যায়, "The crucial factor in the situation was

a tremendous famine of able person—a famine of experienced, able and above all honest and public spirited citizens with a working knowledge of how to run a country on modern lines" (Communism and the West in the Asian countries).[৫১]

অতএব, একথা বলা যায় যে, পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়নি, বরং তা বিকাশের জন্য যথোপযুক্ত সময় ও সুযোগ দেয়া হয়নি।

সূত্র নির্দেশ ও টীকা

১ অধ্যাপক এমাজ উদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা, করিম বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৬৭।

২ ঐ, পৃ. ৬৭-৬৮।

৩ ঐ, পৃ. ৬৮।

৪ মো: রুহুল আমিন, বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা: একটি সমীক্ষা, অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৬, পৃ. ২।

৫ ঐ।

৬ ঐ।

৭ অধ্যাপক এমাজ উদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

৮ Eric Taylor, The House of Commons at Work, London, 1967, P. 107.

৯ Sir Barnett Cocks (ed.), Erskine May's Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, London, 1964, P. 298.

১০ D.G. Kousoulas. On Government and Politics, Chalefonia, 1982, P. 15.

১১ মো: রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

১২ ঐ, পৃ. ৭।

১৩ ঐ।

১৪ মোহাম্মদ আবুল কাসেম, তুলনামূলক রাজনীতি, সোনালী প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং লি:, রাজশাহী, ১৯৯০, পৃ. ২৭৬।

১৫ ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন এবং পরিবর্ধিত, পরিবর্তিত ও সংশোধিত ১৯৩৫ সালের আইন-ই ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সাংবিধানিক আইনগত কার্যকলাপের মৌল দলিল।

১৬ মো: রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

১৭ S.A. Akanda, East Pakistan and politics of regionalism, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Denver, 1970, P. 371; K.B. Sayeed, Pakistan: The formative phase, 1857-1948, Oxford University Press, Karchi, 1968, PP. 232-233.

১৮ S.A. Akanda, Op.cit., P. 372; M. Ahmed, Government and politics in Pakistan, Pakistan Publishing House, Karachi, 1959, PP. 46-50.

১৯ K.B. Sayeed, Op.cit., PP. 235-257.

২০ বিপুল রঞ্জন নাথ, বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ ১৮৬১..., সলিমাবাদ প্রেস, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ২৪৪-২৪৫।

২১ আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, গণতন্ত্রের অন্বেষায় বাংলাদেশ, এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪।

২২ ঐ।

২৩ K. Callard, Pakistan-A Political Study, George Allen and Unwin Ltd., 1957, London, 1957, P. 133.

২৪ Ibid., P. 135.

২৫ M.A. Chaudhuri, Government and Politics in Pakistan, P.R. Saha Dhaka Press, Dhaka, 1968, P. 168.

২৬ বিপুল রঞ্জন নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

২৭ M. Ahmed, Op.cit., P. 99.

২৮ Ibid.

২৯ বিপুল রঞ্জন নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫০।

৩০ ড. মো. মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪২।

৩১ তমিজ উদ্দিন খান, কালের পরীক্ষা ও আমার জীবনের দিনগুলি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১২৮-১৫৭।

৩২ ড. মো. মাহবুবর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৩৩ ড. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন স্টোর্স, রংপুর, ১৯৯২, পৃ. ৫৫।

৩৪ ঐ।

৩৫ M.A Chaudhuri, Op.Cit., P. 235.

৩৬ K.B. Sayeed, The Political System of Pakistan, O.U.P., Lahore, P. 65.

৩৭ আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৩৮ এইচ. রহমান, বাংলাদেশের রাজনীত ও সংবিধান, আইডিয়েল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৭৬-৭৮।

৩৯ K. Callard, Op.Cit., P. 60.

৪০ বিপুল রঞ্জন নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।

৪১ ঐ, পৃ. ২৫৭।

৪২ ঐ, পৃ. ২৫৮।

৪৩ M.A. Chaudhuri, Op.Cit., P. 238.

৪৪ Ibid.

৪৫ K.B. Sayeed, Op.Cit., P. 86.

৪৬ Ibid., P. 87.

৪৭ বিপুল রঞ্জন নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।

৪৮ এফ. জামান, বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি, বর্ণলেখা প্রেস, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২৩৯।

৪৯ ঐ, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৫০ বিপুল রঞ্জন নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।

৫১ এফ. জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।